Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পাশ্চাত্যকরণ

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাসুদা খাতুন জুঁই
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.9
Pages	১৫১-১৬৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পাশ্চাত্যকরণ

Check for updates

মাসুদা খাতুন জুঁই*

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক চিত্রচর্চার সূত্রপাত ঘটে চিত্রশিল্পের পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার বিপরীতে নিজস্ব চিত্ররূপ নির্মাণের প্রয়াসে। এই পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মূলত ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকরণের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম বা স্বভাববাদী চিত্রচর্চা এবং এই উপহাদেশে এর বিকাশের ছিল পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে এই পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া ছিল প্রাক-আধুনিকতার একটি অংশ। এই প্রবন্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বভাববাদী চিত্ররীতির বিকাশ বা চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্যকরণ এবং তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

আঠারো শতকে ইংরেজদের প্রভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন পশ্চিমা শিল্পের অনুপ্রবেশকে সহজ করেছিল। কিন্তু তারও আগে ষোলো শতকে মুঘল দরবারে পশ্চিমা শিল্পের প্রথম অনুপ্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইংরেজ উপনিবেশের সময় এই অনুপ্রবেশের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে (পার্থ, ১৯৯৪ : ১২)। তবে এই দুই সময়ে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অনুপ্রবেশ এবং এদের সঙ্গতিপ্রবণতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পের অনুপ্রবেশ এবং প্রভাবের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে পার্থ মিত্র বলেছেন—

> Unlike the Mughals for whom European art was primarily exotica and marginal to their concerns, its introduction by the Raj was part of a comprehensive package that sought to reproduce the cultural values of the west. (Partha, 1994 : 12)

পাশ্চাত্যকরণের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটে উপনিবেশ পর্যায়ে যা মুঘল আমলে হয়নি। মুঘল শিল্পীরা মূলত পাশ্চাত্য চিত্রের রীতি কৌশল আয়ত্ত করেন।

১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজদের গোয়ায় অবস্থানের পর ইউরোপ থেকে অনেক ব্যবসায়ী এবং ভ্রমণকারী ভারতে আসতে থাকেন। তারা অনেকেই হয়ত চিত্রকলার নমুনা সাথে এনেছিলেন কিন্তু এর গুরুত্ব সম্রাট আকবরই প্রথম অনুধাবন করতে পারেন (অশোক, ১৯৭৮ : ২২৯)। ১৫৭৩ সালে এন্টনি ক্যাবরল (Antony Cabral)-এর নেতৃত্বে পর্তুগিজ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের পর ইউরোপের শিক্ষা, ধর্ম এবং শিল্পের প্রতি আকবরের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পর ১৫৭৬-৭৭ সালে আকবরের ফতেপুর সিক্রি দরবারে আসেন পেড্রো ট্যাভারেস (Pedro Tavares)। এ সময়েও কিছু ইউরোপীয় শিল্পের নিদর্শন হয়ত আকবরের দরবার পেয়ে থাকবে। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আকবরের আগ্রহ ট্যাভারেস (Tavares)-এর নজর কাড়ে এবং তাঁর কাছ থেকে আকবর পর্তুগিজ পুরোহিত জুলিয়ান

* প্রভাষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পেরেইরা (Julian Pereira) সম্পর্কে অবহিত হন। পেরেইরার (Pereira) সুপারিশে আকবর তাঁর বিশেষ কূটনীতিক আব্দুল্লাহ খানকে গোয়ায় পাঠান রাজকীর ফরমানসহ। ফরমান অনুযায়ী আকবরের দরবারে ১৫৮০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে একদল খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকারী আসেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ফাদার রুডল্ফ একোয়াভিভা (Rudolph Aquaviva), ফ্রান্সিস হেনরিকজ (Francis Henriquez) এবং এন্টনি মনসেরাটে (Antony Monserrate) (Asok, 1978 : 229)। এঁরা আকবরের ইবাদত খানায় ধর্মীয় বই, ধর্মীয় ছবি, মূর্তি এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন। গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষার লেখা বই এবং ধর্মীয় বাণী কম লোকেরই আগ্রহের সঞ্চার ঘটায়। কিন্তু 'যিশু' কিংবা 'ম্যাডোনা' এবং 'মেজাই এর ভক্তি' প্রভৃতি ছবি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । নতুন রীতির চিত্র, এনগ্রেভিং এবং চিত্রায়িত বই মুঘল চিত্রশালার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সেই সময়ে মুঘল দরবারি চিত্রকলায় দেশীয় চিত্রের সঙ্গে পারস্য চিত্রের সংমিশ্রণের পর্যায় চলছিল। ধীরে ধীরে তাঁদের ছবিতে প্রায়শ ইউরোপীয় স্বভাববাদী চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করে। যেমন মডেলিং, পরিপ্রেক্ষিত, ফিগারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি (Asok, 1978 : 230)। আকবর তাঁর শিল্পী দিয়ে অনেক ইউরোপীয় চিত্রের প্রতিলিপি করান। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হল কেশু দাসের করা মার্টিন ভ্যান হিমসখের্ক (Maarten Van Heemskherk)-এর পেইন্টিং অবলম্বনে ফিলিপ গ্যালে (Philip Galle)-র এনগ্রেভিং এর একটি প্রতিলিপি (Milo, 1992: 52) (চিত্র : ১ ও ২)।

চিত্র-১ : সেন্ট ম্যাথু, কেসু দাস, ১৫৮৮

চিত্র-২ : সেন্ট ম্যাথু, ফিলিপ গ্যালে, আনু. ১৫৬৫

ইউরোপীয় প্রভাবের আর একটি যথাযথ উদাহরণ বাসওয়ানের 'বসে থাকা মানুষ' (Seated Man), আনু. ১৫৮০ (চিত্র-৩)।

ছবিটিতে মুখাবয়ব, কাপড়ের ভাঁজ ও ভাঁজের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট এবং অনেকটাই বাস্তব সম্মত (Milo, 1992: 50)। ইউরোপীয় ছবি থেকে মুঘল শিল্পীরা বিশেষভাবে যা শিখলেন তা হল মনুষ্য শরীরের ওজন এবং ডৌল (ভলিউম) তৈরী।

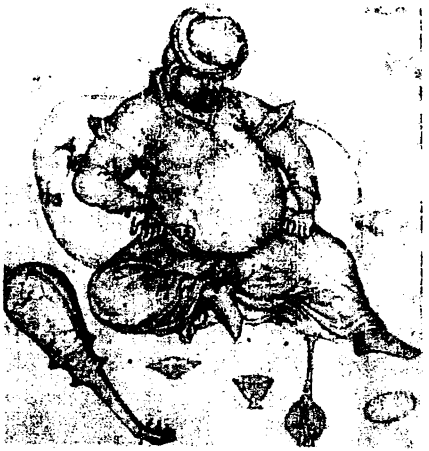

চিত্র-৩ : বসে থাকা মানুষ, বাসওয়ান, ১৫৮০

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়েও ছবিতে ইউরোপীয় প্রভাব দেখা দেয়। আবুল হাসান নাদিরের ছবিতে (চিত্র-৪) এর

চিত্র-৪ : জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসকে আলিঙ্গন করছে, আবুল হাসান নাদির আল জামান, আনু. ১৬১৫

প্রতীকী উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। ছবিতে জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসকে আলিঙ্গন করছেন অর্থাৎ জাহাঙ্গীর অন্যের প্রতি সদয় বা প্রসন্ন ব্যবহার করছেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ

সচেতন থেকে। জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে আছেন সিংহের উপর। অন্যদিকে আব্বাস একটি ভেড়ার উপর দাড়িয়ে আছেন। এরূপ কম্পোজিশনের ছবি প্রথমদিকে মুঘল বা ইরানের ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর সমান্তরাল ছবি পাওয়া যায় ইংলিশ চিত্রকর মার্কস গিরার্টস (Marcus Gheerarts)-এর আঁকা 'The Great Ditchley Portrait of Queen Elizabeth I'-এ (Milo, 1992: 105)।

বহু বছর ধরে মুঘল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার পর ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, তার রক্ষশীল মনোভাব আর মিতব্যয়িতার কারণে, মুঘল শিল্পীদের কদর কমতে থাকে। ফলে এতদিনকার সুনিশ্চিত পৃষ্টপোষকতা হারিয়ে, মুঘল চিত্রশিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের আশায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। তাদের কেউ যান উত্তরে পাহাড়ি রাজ্যগুলির দিকে, কেউ মুঘল সংস্কৃতির ধারক অযোধ্যার নবাবশাহির রাজধানী মুর্শিদাবাদে। আর যারা দিল্লিতে ছিলেন তারা সস্তা দরে নিম্নমানের ছবি বেচে হয়ে পড়লেন বাজার শিল্পী (অশোক, ১৯৯৪: ১২)।

১৭৫৭ সালে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি শক্ত অবস্থান নিলে এ অঞ্চলের শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্য লাভ করেন। ১৭৬০ সালে উইলিয়াম ফুলারটন (William Fullerton), যিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন স্কটিশ সার্জন, পাটনার শিল্পী দিপ চান্দ (Dip Chand) কে নিযুক্ত করেন ছবি আঁকার জন্য (চিত্র-৫)।

চিত্র-৫ : একজন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর প্রতিকৃতি, দিপ চান্দ, মুর্শিদাবাদ স্কুল, আনু. ১৭৬০-৬৪, গোয়াশ, ২৬.৪×২২.৬ সেমি.

এ সময়ে ইউরোপীয়রা এ অঞ্চলের শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা জন ক্লেল্যান্ড (John Cleland) ১৭৩৬ সালে একজন বোম্বে

ডিলারের কাছ থেকে ভারতীয় শাসকদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করেন। অনেক ব্রিটিশ যারা ভারতে বসবাস করত তারা বিভিন্ন ধরনের মিনিয়েচার চিত্র সংগ্রহ করত। শুধু কৌতূহলের বর্শবর্তী হয়ে যে তারা মিনিয়েচার চিত্র সংগ্রহ করত তা নয়, বিষয়বস্তুকেও তারা মূল্যায়ন করত। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি লন্ডনে এরকম অনেক সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে। দিপ চান্দ যে ছবিগুলো করেছিলেন সেগুলো মুর্শিদাবাদ শৈলী থেকে মানের দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্ন ছিল। এই ভিন্নতা কয়েক বছর পর আরো প্রকট হয়। দরবারি শিল্পের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকের অধীনে করা চিত্রে রূপান্তর শুরু হয় ইংরেজদের চাহিদা অনুযায়ী। এ দেশীয় শিল্পীরা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ড্রইং এবং জলরং শিখতে শুরু করেন এবং নিজেদের মিনিয়েচার চিত্রে এর প্রয়োগ ঘটাতে থাকেন (Rosemary et al., 1990 : 195-196)। এর আগে এ অঞ্চলের শিল্পীরা গোয়াশে ছবি আঁকতেন। ধীরে ধীরে তারা জলরং শিখতে আরম্ভ করেন। রঙের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রং পরিহার করে অনুজ্জ্বল রং ব্যবহার শুরু করেন, যেমন— নরম হালকা নীল, সবুজ, এবং গাঢ় বাদামি বা খয়েরি। এই রংগুলো ব্রিটিশরা পছন্দ করত। তারা পরিপ্রেক্ষিত এবং আলোছায়ার ব্যবহার শুরু করল ইউরোপীয় রীতি অনুযায়ী (Mildred, 1992 : 17)। এভাবে ১৭৭০ সালের দিকে কোম্পানি রীতির চিত্রকলা নামে একটি চিত্ররীতির উদ্ভব ঘটে এ দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাবৃন্দ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার এলিজা ইমপে (Elijah Impey) এবং তাঁর স্ত্রী। এলিজা ইমপে ছিলেন কলকাতার প্রধান বিচারপতি। পাটনার তিনজন শিল্পীকে তাঁরা নিয়োগ দেন ১৭৭৬-৮২ এই সময়ের মধ্যে। শিল্পীরা প্রাকৃতিক ইতিহাসের (Natural History) একটি চমৎকার চিত্রমালা তৈরি করেন (চিত্র ৬) (Rosemary et al., 1990 : 195-196)।

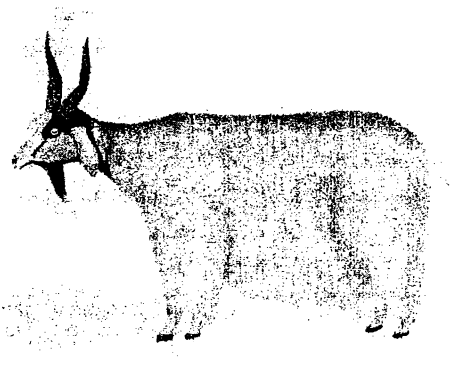

চিত্র-৬ : একটি মেষ, জয়েন আল-দিন, কলকাতা, ১৭৭৮, জলরং, ৫৩.৫×৭৫ সেমি.

১৮০০ সালের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে জনজীবন এবং প্রকৃতির প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়। সাজানো বাগান এবং রোমান রীতির স্থাপত্য যা আগে পছন্দের বিষয় ছিল, তার স্থানে অগোছালো, এলোমেলো, বন্য প্রকৃতির প্রতি আগ্রহের সূচনা ঘটে। আলপ্‌স পর্বতমালা এবং বন্য বাগানের মধ্যে পুরানো বৃহৎ অট্টালিকা বিষয় হিসেবে জনপ্রিয় হয়।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, শিল্পবিপ্লবের উৎপাদিত দ্রব্য, রীতি, বাণিজ্য, এবং কৃষকদের জীবিকাও বিষয় হিসেবে আগ্রহ তৈরি করে (চিত্র-৭)।

চিত্র-৭ : 'জেলেনি', The Shrimper, Illustration to Picturesque Representations of the Dress and Manners of the English.

ব্রিটিশ জীবনাচারের বিভিন্ন প্রথাবিরুদ্ধ এবং আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে প্রকাশ করা হত এবং এই বিষয়গুলোকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হত, তা হলো, picturesque বা সুন্দর বা ছবির মতো। এই picturesque বিষয়গুলো নিয়ে প্রিন্ট এবং ছবির বই প্রকাশিত হয় এবং এর উপর লেখাও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বই, যেমন : *Picturesque Representation of the Dress and Manners of the English* (১৮১৪), ডব্লিউ. এইচ. পাইনের (W. H. Pyne), *Microcoom* এবং জর্জ ওয়াকারের (George Walkers) *Costume of York Shire* (১৮১৪) ইত্যাদি। এই বইগুলো ইংল্যান্ডের বৈচিত্র্যময় জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রক্রিয়াটি ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভারতবর্ষেও প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষের মানুষজনের শ্রেণি, পেশা, আচার, প্রকৃতি, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, ধর্মীয় জীবন, সমাজজীবন, প্রাচীন স্থাপত্য, প্রভৃতি বিষয় কোম্পানি শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হতে থাকে (Midred, 1982 : 8)।

আঠারো শতকের শেষের তিন দশকের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে দৃশ্যগত কোনো ধারণা ছিল না। পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভারত সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব বইয়ে রেখা এনগ্রেভিং-এর মাধ্যমে সচিত্রকরণ করা হতো পেশাদার এনগ্রেভারদের দিয়ে, যারা কখনোই ভারতবর্ষ দেখে নাই। অপেশাদার শিল্পীর আঁকা ছবি, ভারত ভ্রমণকারী বা ভারতীয় শিল্পীর করা ছবি দেখে এই পেশাদার শিল্পীরা

এনগ্রেভিংগুলো করতেন। অতিকল্পনা এবং ভারত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এই বইগুলোতে প্রকাশ পেত। ১৭৭০ সালের পর পেশাদার ইউরোপীয় শিল্পীরা ভারতে আসতে শুরু করেন এবং ভারতকে ব্রিটিশ রুচির দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন (Midred, 1982 : 8)। এই শিল্পীরা ইউরোপে প্রথম সারির শিল্পী ছিলেন না, তারা প্রধানত টাকা উপার্জন এবং ভাগ্য ফেরানোর আশায় এখানে আসেন। তারা এখানে মূলত তেল রং, জলরং এবং ড্রইং করতেন। পরে এই ছবিগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে এনগ্রেভিং করতেন।

বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন টিলি কেটল (Tilly Kettle) ১৭৬৯ সালে, তারপর আসতে থাকেন জন জোফানি (Johann Zoffany), আর্থার ডেভিস (Arthur Devis), টমাস হিকি (Thomas Hicky), টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল (Thomas and William Daniell), ফ্রাঁসেসকো রিনাল্ডি (Francesco Renaldi), রবার্ট হোম (Robert Home), জেমস ওয়েলস (James Wales), উইলিয়াম হজেস (William Hodges), জেমস ফার্গুসন (James Fergusson), চার্লস ডয়েলি (Charles D'oyly) প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এই সব শিল্পী ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম বা স্বভাববাদী রীতিতে কাজ করতেন। তাঁদের ছবি আঠারো এবং উনিশ শতকে এ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির শিল্পরুচি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও কোম্পানি রীতির শিল্পীদেরও তাঁরা প্রভাবিত করেন (মৃণাল, ২০০৫ : ১০০) (চিত্র-৮)।

চিত্র-৮ : কালা-বিবি, ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি, ১৭৮৭

এভাবে তেলরং এবং স্বভাববাদী চিত্ররীতি ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রচর্চার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এটি আরো জোরালো হয় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

কোম্পানি চিত্রকলা এবং স্কুলে একাডেমিক পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যবর্তী কয়েক দশকে আর একটি চিত্রচর্চার বিকাশ ঘটে সেটা হলো অনামা শিল্পীদের তেলরঙের ছবি। ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রভাবে বা তাঁদের সান্নিধ্যে এসে এ অঞ্চলের লৌকিক বা দরবারি

শিল্পীরা, যাঁরা শহরে চলে এসেছিলেন, তেলরং মাধ্যমটি নিয়ে স্বভাববাদী রীতিতে ছবি আঁকেন। তাদের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক বা ধর্মীয়। স্বভাববাদী রীতির সঙ্গে লৌকিক রীতি এবং মিনিয়েচার রীতির সংমিশ্রণ ঘটে অনামা শিল্পীদের ছবিতে (মৃণাল, ২০০৫ : ১০২) (চিত্র-৯)।

চিত্র-৯ : বিষ্ণু ভক্তদের মিছিলে গৌর ও নিতাই, গোয়াশ, জলরং, উনিশ শতক, চিতপুর

এক সময় এই ছবিকে ডাচ-বেঙ্গল বা ফ্রেঞ্চ বেঙ্গল স্কুলের ছবি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এই ধারার অনেক তেলচিত্রই পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে চুঁচুড়া বা চন্দননগরের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। এই দুটি শহর যেহেতু ওলন্দাজ ও ফরাসিদের দখলে ছিল, তাই মনে করা হত এগুলো ওই দুই দেশের চিত্রশিল্পের প্রভাবে আঁকা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধু চুঁচুড়া বা চন্দননগর নয়, কলকাতার অনেক উৎস থেকেও এই ছবি পাওয়া গেছে। এ ধারায় অনেক ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে পুরানো জমিদার বাড়ির অন্দর মহল থেকে, যা থেকে বুঝা যায়, এগুলিকে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত শ্রেণির সংগ্রাহকরা ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির মতো গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু স্বাভাবিকতার রীতিতে আঁকা এই সব পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয়ের ছবির প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল (মৃণাল, ২০০৫ : ১০২)।

স্বাভাবিকতার রীতির বিকাশের শেষ ধাপ হল আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ১৮১৩ সালে পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের সময় বলা হয় যে, শিক্ষার জন্য বছরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। এ কথা সাবেক টোল মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষার জন্য বলা হয়েছিল। টোল মাদ্রাসার শিক্ষা সার্বজনীন ছিল না এবং দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা এ যাবৎ এ অঞ্চলের কোনো প্রশাসনেরই ছিল না। সরকারি শিক্ষানীতি এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় কিনা, তা বিবেচনার দায়িত্ব নতুন ব্যবস্থা-সচিব টমাস ব্যাবিংটন মেক'লে (Thomas Babington Macaulay) কে দেওয়া হলে তিনি ১৮৩৫ সালে যে শিক্ষা প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন, সেটিই

ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ হয়ে ওঠে (শোভন, ১৯৯৮ : ৬৮)। মেক'লে তাঁর প্রস্তাবে যা সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা হলো ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষিত মানুষকে চিন্তায় ভাবনায় এমনই শর্তবদ্ধ করে তোলা যার ফলে সেই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ চেহারায় এদেশি হলেও মনেপ্রাণে হবে শাসকের দাস। এরাই শাসনের নিচু পদগুলিতে থেকে শাসনযন্ত্র চালাতে সহায়তা করবে (শোভন, ১৯৯৮ : ৬৮)।

ফ্রান্সে ১৭৯১ সালে কারুশিল্পোৎপাদনে গিল্ড বা সমবায় প্রথা বন্ধ করা হয় এবং যন্ত্রসভ্যতর বিকাশে সহায়ক প্রকৌশল শেখাবার জন্য ১৭৯৫ সালে একোল পলিতেনিক বা বিভিন্ন প্রকৌশল শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৬ সালে প্যারিসে শিল্পকলা বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয় একোল দে বোজার বা চারুকলা বিদ্যালয় অর্থাৎ স্কুল অব ফাইন আর্টস। সেই থেকে বোজার বা চারুকলা বা ফাইন আর্টস অভিধাটি ব্যাপক রূপ লাভ করে। ১৮২০ সালে যন্ত্রসভ্যতার প্রকৌশল সহায়ক মেকানিক্স ইনস্টিটিউট নামে লন্ডনে একটি পলিকেটনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৩৫-৩৬ সালে সিলেক্ট কমিটি অন আর্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার্স-এর উদ্যোগে লন্ডনে স্কুল অফ ডিজাইন প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বা ব্যবসায়িক শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে ইউরোপে অ্যাকাডেমিক ও পলিটেকনিক বিশেষ উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। যন্ত্র সভ্যতার বিকাশে এটা ছিল অনিবার্য। অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্য ছিল চারুকলার বিকাশ। পলিটেকনিকের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক শিল্পবির্বধন (শোভন, ১৯৯৮ : ৭০)। উনিশ শতক থেকে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষকে প্রবৃত্ত করার কথা বলা হলেও আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রির সংজ্ঞা এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য শিক্ষিত মানুষেরাও জানতেন না। তাদের ধারণা ছিল ছবি আঁকার বিষয়টি পটুয়াবৃত্তি নয় দরবারি বিনোদন (শোভন, ১৯৯৮ : ৭১)।

এ অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান গঠিত হলেও এ দেশের মানুষদের কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ করতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। তবে ক্রমবর্ধমান অ্যাংলা ইন্ডিয়ান বা ইউরোপীয়দের কর্মসংস্থানের আগ্রহে এদেশের কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে এক হয়ে বেসরকারি উদ্যোগে মেকানিক্স ইনস্টিটিউট স্থাপনে তৎপর হয়েছিলেন (শোভন, ১৯৯৮ : ৭২)।

মেকানিক্স ইনস্টিটিউট বা কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে আরো একটি উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। বিস্তীর্ণ উপনিবেশে পথ তৈরি ও রেললাইন পাতা শুরু হয় সামরিক তৎপরতায়। সেই সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলের ভৌগোলিক, আকরিক, জনবিন্যাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের জন্যও অনেকগুলি সমীক্ষণ দপ্তর স্থাপিত হয় শাসনের স্বার্থে। একই সঙ্গে ইমারত নির্মাণও শুরু হয় ব্যাপকভাবে। এসবের জন্য অনেক কর্মীর প্রয়োজন হয়। নিম্নস্তরের কাজে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষ কর্মী আনানো ছিল ব্যয়সাধ্য। এ দেশেই সেই দক্ষতা গড়ে তুলে চাকরির যোগান তৈরি করা সহজ ছিল। শুধুমাত্র অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই নয় এই নতুন কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় এ অঞ্চলের মানুষও সমান আগ্রহী ছিলেন। (শোভন, ১৯৯৮ : ৭৩)

মেকানিক্স ইনস্টিটিউট কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত হলেও অঙ্কন শিক্ষা এই বিদ্যালয়ে সব শিক্ষার ভিত্তি ছিল। একারণে এখানেই ঘটে শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত। ১৮৩৯

সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই মেকানিক্স ইনস্টিটিউট চল্লিশ দশক-এর শেষে বন্ধ হয়ে যায়। এর পর ১৮৫০ সালে মাদ্রাজের অধিবাসী সার্জন ড. আলেকজান্ডার হান্টার (Alexander Hunter) তাঁর নিজের খরচে মাদ্রাজে প্রথম আর্ট স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'দ্য স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। মুম্বাইতে ১৮৫৬ সালে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হত 'সোসাইটি ফর দ্যা প্রমোশন অব ইন্ডিাষ্ট্রিয়াল আর্ট' নামক সংস্থার উদ্যোগে। শুরুতে স্কুলে শেখানো হত মাটির কাজ বা ক্লে মডেলিং এবং ছবি আঁকা। ক্লে মডেলিং-এ এম রিগো (M Rigaud) নামে একজন শিল্পী যান্ত্রিকভাবে শেখাতেন। ছবি আঁকা শেখাতেন এম আগিয়ার (M Agyer) নামে এক শিল্পী (মৃণাল, ২০০৫ : ১০৪)। ১৮৬৫তে স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয় 'দ্যা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট'। ১৯৫১ সালে এই স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়। নাম হয় 'দ্যা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্র্যাফট'। ১৮৭৬ এর এপ্রিলে এই স্কুলের সঙ্গে একটি আর্ট গ্যালারি বা শিল্প সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয় (মৃণাল, ২০০৫ : ১০৪)।

হেনরি হোভার লক (Henry Hover Locke) গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৮৬৪ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত। এখানে আসার আগে তিনি ছিলেন লন্ডন স্কুল অব ডিজাইন-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট। লন্ডনের সাউথ কেনসিংটন স্কুলে শিল্পশিক্ষার যে মডেল ছিল সেই ভিত্তিতেই এখানেও তিনি শিল্পশিক্ষার উপর জোর দেন। কেনসিংটনে ব্রিটিশ শিল্পী জোশুয়া রেনল্ডস-এর অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতি অনুসরণ করা হত। তখন অবশ্য ইংল্যান্ডের অন্য শিল্পীরা এই বাঁধাধরা স্বাভাবিকতার রীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। টার্নার ও প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পীদের আন্দোলন এর দৃষ্টান্ত।এই নতুন ধারার প্রতিক্ষেত্রে লক-এর কোনো সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল না। ভারতে শিল্পশিক্ষার এসব নতুন পদক্ষেপের বিষয়ে তিনি ভাবেনওনি। তাই কলকাতা আর্ট স্কুলে একমাত্র স্বাভাবিক রীতির চর্চা হত। এখানকার শিল্পীরা সেটাই আয়ত্ত করেছিলেন (মৃণাল, ২০০৫ : ১০৪)।

অধ্যক্ষ লকের শিক্ষকতার শুরুর দিকে যে সব শিল্পী আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন হলেন : অন্নদাপ্রসাদ বাগচি ও শ্যামাচরণ শ্রীমানী। অন্নদাপ্রসাদ বাগচি প্রথমে কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি ও এনগ্রেভিং-এর কলাকৌশলে দক্ষতা অর্জন করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের '*দ্যা অ্যান্টিকুইটিজ অব ওরিশা*' গ্রন্থের জন্য তিনি ছবি আঁকেন ১৮৬৮-৬৯ সালে। এই সচিত্রকরণ তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তেলরঙে একজন দক্ষ প্রতিকৃতি শিল্পী ছিলেন তিনি। ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি তেলরঙে অনেক রচনাধর্মী ছবিও আঁকেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও তৈরি করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর্ট স্কুলের অন্য ছাত্ররা। যেমন, নবকুমার বিশ্বাস, ফণীন্দ্রভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল। এই স্টুডিও অনেক সচিত্রিত বই, রঙিন লিথোগ্রাফ তৈরি করত স্বাভাবিকতা-আশ্রিত রীতিতে, পৌরাণিক নানা বিষয় রূপায়িত হত সেখানে (চিত্র-১০)। সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এ অঞ্চলে স্বাভবিকতা-আশ্রিত রীতির প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (মৃণাল, ২০০৫ : ১০৫)।

চিত্র-১০ : শ্রী শ্রী মহাদেব (শিব), ক্রোমোলিথোগ্রাফি, কলকাতা আর্ট স্টুডিও

আর্ট স্কুলের আরও যে সব ছাত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাভাবিকতার রীতিতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শশিকুমার হেশ, গঙ্গাধর দে, প্রমথনাথ মিত্র ও বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃণাল, ২০০৫ : ১০৫)।

হেনরি হোভার লকের পর অধ্যক্ষ হন এম শাউমবার্গ (M Schaumburg)। তারপর অধ্যক্ষ হন উইলিয়াম হেনরি জবিন্স (William Henry Jobbins)। জবিন্সের পর অধ্যক্ষ হন আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল (Ernest Binfield Havell)। কলকাতা আর্ট স্কুলে হ্যাভেল যোগ দেন ১৮৯৬ সালে। তাঁর অধ্যক্ষতাকালে তিনি এখানকার শিক্ষা ধারায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। এর আগে একমাত্র পাশ্চাত্য রীতি কৌশলেই শিল্পকলা শেখানো হত। প্রাচ্য বা ভারতীয় শিল্পকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হত না। হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পকলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং মনে করেন, ভারতীয় শিল্পরীতি অনুশীলনের ভিতর দিয়ে না গেলে ভারতীয় শিল্পীর প্রকৃত শিল্পবোধ জাগবে না। সে জন্য তিনি পাশ্চাত্য রীতির বদলে প্রাচ্য রীতিতে শিল্পশিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি আর্ট স্কুল থেকে ইউরোপীয় চিত্র ভাস্কর্যের নির্দশনগুলো সরিয়ে সেখান রাখেন প্রাচ্য রীতির চিত্র ভাস্কর্য (মৃণাল, ২০০৫ : ১১০)। এছাড়া তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন, যথা : ১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এবং ২. ফাইন আর্ট (শোভন, ১৯৯৮ : ১৮৩)। প্রথম বিভাগে তিনি আলংকারিক নক্শা শেখাবার ব্যবস্থাও করেন। যেমন, তিনি জয়পুর থেকে প্রথাগত আরায়েস ভিত্তিচিত্র পদ্ধতি শেখাবার জন্য নরসিংলাল নামে একজন কৌলিক বৃত্তিজীবী ভিত্তিচিত্র পদ্ধতি বিশারদকে ডেকে আনেন (শোভন, ১৯৯৮ : ১৯১)। হ্যাভেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> While European art retains the sense and form of its earthly environment, Indian art in always striving to realise something of the Universal, the Eternal and the Infinite. Soaring into the highest empyrean, it is ever trying to bring down to earth something of the things above. Indian art is essentially idealistic, mystic, symbolic and transcendental... Indian art appeals only to the imagination and strives to realise the spirituality and abstraction of a supra-terrestrial sphere (W.G. Archer, 1959 : 30-31)।

হ্যাভেল মনে করতেন, ভারতীয় শিল্পীদের ভারতীয় ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে যে ঐতিহ্য ব্রিটিশদেরও পূর্ববর্তী। শিল্পীরা ঐতিহ্যগত বিষয় ব্যবহার করবেন, ঐতিহ্যগত আবেগকে প্রকাশ করবেন এবং ঐতিহ্যগত রীতিকে প্রয়োগ করবেন তাঁদের শিল্পে (W.G. Archer, 1959 : 30)। শিল্প সম্পর্কে হ্যাভেলের মতবাদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে এবং অবনীন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের নতুন শৈলী নির্মাণে দৃঢ় ভূমিকা রাখে।

কিন্তু আর্ট স্কুলের ছাত্রদের একটি অংশ পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষায় এতই অভ্যস্ত ও আগ্রহান্বিত ছিলেন যে তাঁরা হ্যাভেলের সিদ্ধান্তকে মেনে নেননি। ১৮৯৭ সালে এই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ গুপ্ত। রণদাপ্রসাদ তখন আর্ট স্কুলে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন(চিত্র-১১)।

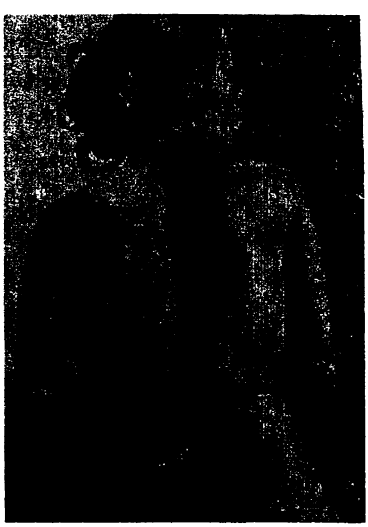

চিত্র-১১ : রণদাপ্রসাদ গুপ্ত

১৮৯৭ সালে এই ছাত্ররা সরকারি আর্ট স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে বৌবাজারে নতুন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সে বছর ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মের হীরক জয়ন্তী বা ডায়মন্ড জুবিলি। সেজন্য ওই স্কুলের নাম দেওয়া হয় 'জুবিলি এ্যাকাডেমি'। রণদাপ্রসাদ যদিও তখন ছাত্র তবু তাঁর প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও শিক্ষকতাতেই জুবিলি অ্যাকাডেমি চলত এবং

দুদশকেরও বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল (মৃণাল, ২০০৫ : ১১০)। এখানে অ্যাকাডেমিক রীতির শিক্ষার উপরই জোর দেয়া হত এবং এখান থেকে অনেক প্রখ্যাত শিল্পী বের হয়েছেন। যেমন, নরেন্দ্রনাথ সরকার, ফণীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ শীল, অতুল বসু, বসন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমথ মল্লিক, অভয়চরণ দাস, এবং প্রহ্লাদ কর্মকার। এদের অনেকেই স্বাভাবিকতার রীতিকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করে চিত্রকলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (চিত্র-১২) ও অতুল বসু (চিত্র-১৩)।

চিত্র-১২ : গোলাপ অথবা কাঁটা?, হেমেন মজুমদার, ১৯৩৬, কাগজে জলরং

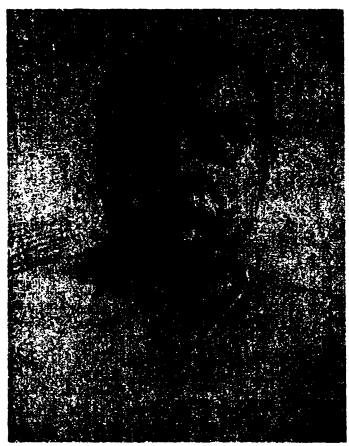

চিত্র-১৩ : বাংলার বাঘ, অতুল বসু, ১৯২২, পেনসিল স্কেচ

হেমেন্দ্রনাথ জলরং ও তেলরঙে যে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা আজকের শিল্পীদেরও উদ্বুদ্ধ করে। অতুল বসু প্রতিকৃতি চিত্রী হিসেবে প্রখ্যাত হলেও, নিসর্গ চিত্রেও দক্ষ ছিলেন। আরেকজন শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৫৩) যদিও জুবিলি অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলেন না, তবুও তাঁর নামও এখানে উল্লেখ করতে হয়। প্রতিকৃতি ও নিসর্গ চিত্র দুটিতেই তিনি বিরল দক্ষতা দেখিয়েছিলেন (মৃণাল, ২০০৫ : ১১৫)।

প্রথম দিকে পাশ্চাত্য চিত্ররীতি ব্রিটিশদের চেতনার আলোকে এ উপমহাদেশের চিত্রে সংমিশ্রিত হয়ে উচ্চমানের মিনিয়েচার শিল্পের ঐতিহ্য ধ্বংস করে। ইউরোপীয় চিত্রভাষা অভিযোজনের ফলে এদেশে একটি মিশ্র রীতির উদ্ভব হয়। কালক্রমে এই ইউরোপীয় স্বভাববাদীরীতি আমাদের আধুনিক চিত্রকলা বিকাশের পথ খুলে দেয়। এ উপমহাদেশে আধুনিক চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেখাড়ি হয়েছিল স্বভাববাদী চিত্ররীতি অনুশীলন করে। বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতি শিখে চিত্রচর্চার যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই স্বভাববাদী রীতির মধ্যে নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্বদেশপ্রেমকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। অনামা শিল্পী কিংবা আর্ট স্কুলের প্রশিক্ষিত

শিল্পীদের বেশির ভাগেরই চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল এ দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ কারণে স্বভাববাদী রীতি আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার গোড়া পত্তনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অশোক ভট্টাচার্য, ১৯৯৪। *বাংলার চিত্রকলা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

মৃণাল ঘোষ, ২০০৫। *বিংশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রকলা ও আধুনিকতার বিবর্তন*, প্রশিক্ষণ : কলকাতা।

শোভন সোম, ১৯৯৮। *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

Asok Kumar Das, 1978. *Mughal Painting During Jahangir's Time*, The Asiatic Society, Calcutta, India.

Milo Cleveland Beach, 1992. *The New Cambridge History of India, Mughal and Rajput Painting*, Cambridge University Press, United Kingdom.

Mildred and W. G Archer, 1955. *Indian Painting for the British, 1770-1880*, Oxford University Press, UK.

Mildred Archer, Ronald Lightbown, 1982. *India Observed, India as Viewed by British Artists 1760-1860*, Victoria and Albert Museum, UK.

Partha Mitter, 1994. *Art and Nationalism in Colonial India, 1850-1922, Occidental Orientations*, Cambridge University Press, Great Britain.

Rosemary Grill, John Guy, Veronica Murphy, Susan Stronge and Deborah Swallow, 1990. *Arts of India; 1950-1900*, Victoria and Albert Museum in Association with Mapin Publishing Pvt. Ltd, India.

W. G. Archer, 1959. *India and Modern Art*, Ruskin House, George Allen and Unwin Ltd. London.